রোশনি

সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অনন্য পত্রিকা

নববর্ষ সংখ্যা

সাম্মানিক সম্পাদক

আশিসকুমার গায়েন

Scanned with OKEN Scanner

সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অনন্য পত্রিকা

নববর্ষ সংখ্যা

প্রকাশ - ৭ই জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ (ইং - ২২শে মে ২০১১) ৩য় সংখ্যা

উপদেষ্টা মণ্ডলী -
আশিস সান্যাল কৃষ্ণা বসু ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
ডঃ মোহনলাল মণ্ডল দিলীপ বসু

সাম্মানিক সম্পাদক ঃ আশিসকুমার গায়েন

সহ-সম্পাদক ঃ
সাতকর্ণী ঘোষ কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী

প্রকাশক ঃ
এস. গায়েন

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ আশিসকুমার গায়েন

বর্ণসংস্থাপন ঃ

সত্যবালা ডট্ কম, বলাই দাস , হাওড়া

মুদ্রণ ঃ বাসন্তী প্রেস ৭০/২ হরি ঘোষ স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭

দফ্তর ঃ সুপ্রীতি গায়েন
প্রশস্থ , সাহাপাড়া, পোঃ- প্রশস্থ,
ভায়া আন্দুল-মৌরি, হাওড়া - ৭১১৩০২

সম্পর্ক ঃ ৯৪৩৩৩৩৭২১৮ /
(০৩৩) ২৬৬৯ ৮৩২৬
E-mail : ashish09–cal@yahoo.in
WEB SITE :
http://wwww.
calcuttayellowpages.com/adver/
108685.html

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পাতিরাম কলেজস্ট্রিট মোড় , কলকাতা
কিশলয়- মহিয়াড়ী , আন্দুল, হাওড়া
প্রয়াস - মুন্সীরহাট সি.টি.সি. বাসস্ট্রান্ড, হাওড়া
মূল্য - ২৫ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় -২

কবিতা - ৩ - ১৩
আশিস সান্যাল কৃষ্ণা বসু ভবাণীপ্রসাদ মজুমদার ব্রত চক্রবর্তী বিপ্লব মজুমদার কার্তিক মোদক জ্যোতির্ময় দাশ অভিজিৎ ঘোষ ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতমকুমার দে অরূপ পান্তি জয়ন্ত রসিক শ্রীজিৎ সন্দীপ বেবী পাল অমিত চট্টোপাধ্যায় গোপাল কর্মকার মদন ভড়

প্রবন্ধ- ১৪- ৪২
তরুণ মুখোপাধ্যায় প্রত্যুষ কুমার জানা স্বপন নন্দী ড. মোহনলাল মণ্ডল অমল রায়

কবিতা- ৪৩-৫৭
সুভাষ মণ্ডল দীনবন্ধু নায়ক ত্রিদিব মিশ্র গুণেন দত্ত বলাই দাস বরুণ চট্টোপাধ্যায় অমিত কাশ্যপ নীল কাশ্যপ লিপিকা ভদ্র অনিন্দিতা দাস রাখী মুখোপাধ্যায় নীলাঞ্জনা হাজরা দিলীপ চক্রবর্তী শেফালী চক্রবর্তী সুদীপ মুখোপাধ্যায় অমিতাভ দাশশর্মা অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় তুষার বসু নুরুল আমিন বিশ্বাস অরুনাভ রাহা রায় তন্ময় দে বিশ্বরূপ চক্রবর্তী স্বাতী ব্যানার্জী ডাঃ শ্যামল গোস্বামী কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী সরিৎ দত্ত মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় সুখেন মণ্ডল অরুণকান্তি বালা রাহুল দাশগুপ্ত

গল্প - ৫৮ - ৮৪
দিলীপ বসু শান্তনু সাহা সাতকর্ণী ঘোষ সবিতা বেগম শুভ্রা সান্যাল চিত্রপ্রিয় চ্যাটার্জী আশিসকুমার গায়েন

Scanned with OKEN Scanner

দুই বোন, মালঞ্চ : তত্ত্ব ভাষ্য জীবনভাষ্য

—প্রত্যুষ কুমার জানা

"কোন্ ক্ষণে
জীবনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুইনারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি!
একজন উর্ব্বশী সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী, সে কল্যানী,
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।" (দুইনারী/বলাকা/রবীন্দ্রনাথ)

"সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুই ভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল, একজন সুন্দরী , তিনি উর্ব্বশী, বিশ্বের কামনা রাজ্যে আধিপত্য করেন, আর একজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যানী, একজন স্বর্গের অপ্সরী, অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী" একজন হরণ করেন, আর একজন পুরণ করেন। "একনারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন অন্যজন তাকে শিশির স্নাত করে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তুললেন" ১৩৩৯ ও ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। দুই নারী তত্ত্বকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে কোমর বেঁধে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন সমগ্র রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে এমন আর দেখা যায় নি। তার কয়েক মাস পরেই একই সমস্যাকে সামনে রেখে লিখলেন 'মালঞ্চ' উপন্যাস। কোন তত্ত্বকে সামনে রেখে যখন ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করতে চান তখন বোঝা যায় আপন উদ্দেশ্যের অভিমুখেই তিনি যাত্রা করবেন। রবীন্দ্রনাথ কোন এক বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন—

"সত্য কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধে ছিল দুটি বাহুডোরে

Scanned with OKEN Scanner

আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে !"

বৈষ্ণব পদাবলীর মিলন বিরহের বর্ণনা কি শুধুই (বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী) তত্ত্বের কাব্য রূপায়ণ? বাস্তব জীবনের কোন নারীর ভূমিকা কি সেখানে নেই? প্রশ্নটা এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন', 'মালঞ্চের' আলোচনা প্রসঙ্গে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল অন্বিষ্ট 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাস কি শুধুই দুই নারী তত্ত্বেরই শিল্প রূপায়ণ? না কি তত্ত্ব উত্তরিত কোন জীবন উপন্যাসে শিল্পীত হয়ে উঠেছে?

'দুইবোন' উপন্যাসের সূচনায় দেখি—

" মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পন্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া"

১৩৪০ বঙ্গাব্দের 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'দুই বোন' উপন্যাসের মর্ম ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"দুই বোন গল্পটি সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েছ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি, সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা , কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুয়ের মিশেল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মাতৃ অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। অল্প স্ত্রীই অমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নতুন করে তোলে।"

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয় আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়।

"শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্য স্নেহ সতর্ক মাকে পেয়েছিল, তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগলো, ট্রাজেডি ঘটলো। অপর পক্ষে অতি নির্ভর লোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে, তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণ যাত্রার মোটর রথের শোকার। তারা চায় পতিগুরুকে। পদধুলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু বিপরীত জাতীয় মেয়ে ও নিশ্চয় আছে। যারা অতিলালন অসহিষ্ণু পুরুষকেই

Scanned with OKEN Scanner

চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্মি সেই জাতের। শুরুতেই চালককে নিয়ে গুরুকে নিয়ে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে এমন এক পুরুষকে পেলে, যার চিত্ত অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই, যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই — যে যথার্থ তার জুড়ি"

'দুই বোন' উপন্যাসের মর্মব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

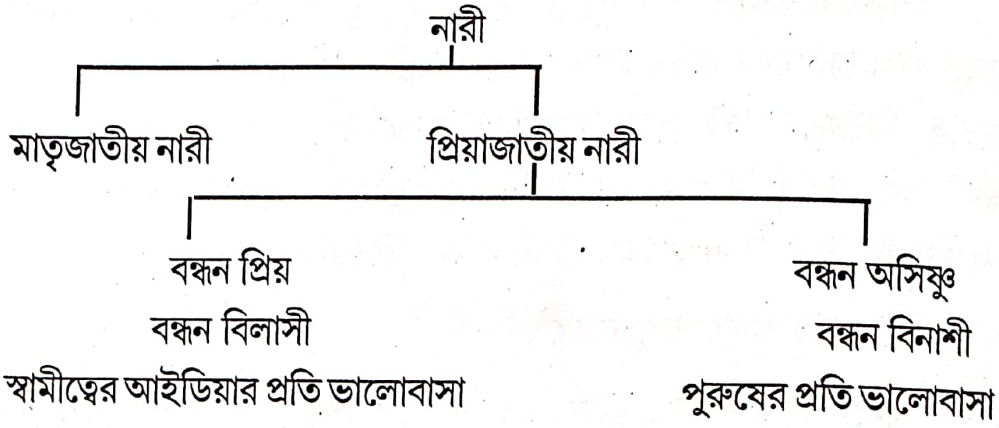

মাতৃজাতীয় নারী পুরুষকে সন্তান স্নেহে লালন করতে চায়। নিজের স্বতন্ত্র রীতি অনুযায়ী স্বামীর পূর্ণতা সাধন করে। তার নিজস্ব প্রতিভায় সংসার নতুন হয়ে ওঠে। তারমধ্যে কল্যাণী মূর্তিই প্রকটিত। প্রিয়াজাতীয় নারীর দুই শ্রেণীর কথা রীবন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক জাতীয় নারী যারা সংসারের স্বামীত্বের বন্ধনের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। বন্ধুটাই তাদের কাছে বিলাস। তারা স্বামীত্বের আইডিয়াকেই ভালোবাসে। সঙ্গ ত কারণেই পতির উপর তারা নির্ভরশীল। পতি তাদের কাছে গুরু, পদধুলির কাঙালিনী তারা। প্রিয়াজাতীয় নারীর মধ্যে আর এক ধরণের নারী আছে যাদের বলা যেতে পারে বন্ধন অসহিষ্ণু, বন্ধন বিনাশী। তারা শুধু স্বামীত্বের আইডিয়াকে ভালোবাসে না, পুরুষকে ভালোবেসেই তাকে জয় করতে চায়। আধুনিক ব্যক্তিত্বময়ী নারী তার মধ্যেই তার নারীত্বের পূর্ণতাকে খুঁজে পায়। ঊর্মিমালাকে রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় ধরনের নারী হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

'দুই বোন' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শর্মিলাকে মাতৃজাতীয় নারী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। মাতৃজাতীয় নারীর স্বরূপ ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন "ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু, জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন উষ্ণতা, ভরিয়ে দেন অভাব"

শর্মিলার বাহ্যিক আকৃতি ও বেশভূষার মধ্যে কল্যানময়ী মায়ের স্নিগ্ধমূর্ত্তিই প্রকটিত করলেন—

Scanned with OKEN Scanner

"বড়বড় শান্ত চোখ ;ধীর গভীর তার চাহনি, জলভরা নব মেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল ;সিঁথিতে সিঁন্দুরের অরুণ রেখা ;শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত দুই হাতে মকর মুখো মোটা দুই বালা ;সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।"

শশাঙ্কের আরোগ্য ও আরামের জন্য শর্মিলার সস্নেহ ব্যগ্রতা, ছোট্ট শিশুকে স্কুল পাঠানোর আগে মা যেমন করে তার পোষাক বই খাতা ও পেন্সিলের প্রতি যত্নবান হন শর্মিলা শশাঙ্কের প্রতি তেমনি যত্নবান। তাই অফিস বেরনোর সময় তার দুটো পায়ে একই রঙের মোজা আছে কিনা, ঘড়িটা ঠিক কোন্ জায়গায় রাখা আছে, জুতোটা পালিশ করা হয়েছে কিনা, সিগারেটের প্যাকেটটা ঠিক ভরা আছে কিনা, তার তত্ত্বাবধানেই শর্মিলার তৃপ্তি স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের কারণেই শশাঙ্কের ত্রুটি ঘটে কারণ সে বুঝেছে ত্রুটি হলেই শর্মিলা সংশোধন করে দেবে। শশাঙ্কের ত্রুটি সংশোধন যদি হত তবে—"তবে শর্মিলার দিন গুলো হত অনাবাদী কমলের জমির মতো" শশাঙ্কের গাড়িতে সোডার বোতল, শুকনো খাবার যেমন থাকতো, তেমনি বাড়িতে সব সময়ই খাবার গরম করা থাকতো, কখন দরকার হয়, হয়তো কখনো শশাঙ্ক বলবে বেরোচ্ছি ফিরতে দেরী হবে— এই সম্ভাবনায়। কখনো ভোর বেলায় অল্প একটু সর্দির আভাস যেন দেখা দিয়েছে— শর্মিলার এই ভাবনায় শশাঙ্কের কুইনিন খেতে হয়, তার সঙ্গে তুলসী পাতার রস দিয়ে চা। শুধু শারীরিক আরোগ্য ও আরামের সস্নেহ ব্যগ্রতা নয় বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যও শর্মিলার সতর্কতা। তাই অফিসে উপযুক্ত স্থানে শশাঙ্ককে না বসিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতার একজনকে সুপারিশ ক্রমে শশাঙ্কের উপরে বসানো হলে স্বামীকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করতে শর্মিলা চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামায়। শর্মিলা বর্ষা ঋতু হয়ে জল দান করে ফলদানের গৌরবে গৌরবান্বিত হবে বলেই তাই যখন একটা 'প্রকান্ড ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিনরাত জাগায় শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড় কিছু গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব" আর তার নেপথ্যে ভূমিকা নিয়েছে শর্মিলা। "শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত' সেই শর্মিলা যখন অসুস্থ, তার সেবা করে স্বামী কাজ নষ্ট করুক-এ অভিপ্রায় শর্মিলার অসহ্য হয়ে ওঠে, আর তার ভয় হয় মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝিবা। মৃত্যুর পর স্বামীর দৈহিক অযত্ন যাতে তার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন না করে সেই জন্যই বোন ঊর্মিকে এ বাড়িতে আনা হয়েছে। কেননা শর্মিলা বোঝে " মেয়েদের স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না, সমস্তই যে কি রকম শ্রী হীন হয়ে যায়" উপন্যাসিক জানিয়েছেন—"স্বামীর জীবনালোকে এমন কোন প্রত্যন্ত দেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল" স্বভাবতই ঊর্মি আসার পর শর্মিলা বুঝেছে—

Scanned with OKEN Scanner

"আর সবই করেছি কেবল খুশি করতে পারিনি।
ভেবেছিলুম উর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব,
কিন্তু ওতো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে,
... আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা
আমি নিতে পারবো না, আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে,
কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।"

স্বামীর এই শূন্যতাকে পূরণ করতে অভাবকে দূর করতে 'ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে'—নিজের হৃদয়ের দাবিকে উপক্ষা করে, শশাঙ্কের অসুখী রূপ তাপ কে দূর করতে উর্মির সঙ্গে শশাঙ্কের প্রণয়ের কথা জেনেও তাদের নির্জন স্থানে বেড়াতে যেতে দিতে হয়। কেন না তাতে শশাঙ্কের মনের শুষ্কতা দূর হয়। শিশুর কাছ থেকে তার পছন্দের খেলনা কেড়ে নিলে যেমন তার আর্তনাদ মায়ের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, তাই শিশুকে কেড়ে নেওয়া খেলনা ফেরৎ দিয়েই তাকে খুশি করতে হয়, তেমনি মুমূর্ষু শর্মিলা উর্মিমালাকে শশাঙ্কের হাতে সমর্পন করে—

"উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে, যে আমার আপন বোন
তার মধ্যে আমাকে পাবে, আরো অনেক বেশী পাবে, যা আমার
মধ্যে পাওনি... মরবার কালেই আমার সে ভাগ্য পূর্ণ
হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম"

তারপর শর্মিলা বেঁচে উঠলেও তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটেনি। উর্মিমালার সঙ্গে স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। সামাজিক অসম্মানকে উপেক্ষা করতে নেপালের রাজ দরবারে শশাঙ্ককে চাকরি নিতে বলেছে। সেখানে শশাঙ্ক উর্মিমালা ও শর্মিলা একই সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। উর্মির প্রতি কঠোর হতে গিয়েও স্নেহবশত তার হৃদয় বিগলিত হয়। নিজের দাবিকে, ভালোবাসাকে নিঃশেষ করে, নিজের স্বামীকে ভাগ করে নেয় বোনের সঙ্গে, স্বামীকে খুশি করতে— সেই দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কের শর্মিলাকে মনে হয়েছিল দেবী।

আর এক নারী প্রিয়া যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন—

—"আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য মধুর তার মায়া মন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায়, একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বানী"

প্রিয়াজাতীয় নারীর উচ্ছলতা নিয়েই ঊর্মিমালা উপন্যাসে উপস্থিত তাই উপন্যাসিক তার চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বললেন— "ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো, তার চেয়েও

Scanned with OKEN Scanner

তাকে দেখতে ভালো দেখায়, তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝলমল করে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ময়দানে ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, গান, সেতার, মাছধরা—সমস্ত কিছুতেই তার আগ্রহ।

> "তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ ও পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখান ওখানে অল্প একটুখানি ঠেলে ঘুরিয়ে , ঢিল দিয়ে আঁট করে, অঙ্গ শোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্য ভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না, কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দূরন্ত অঙ্গুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্য সঙ্গত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গ দান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে"

যৌবনের অজস্র ভক্তদের কাউকে সে উপেক্ষা করেছে, কারোও প্রতি মনের টান ও হয়েছিল, ভালোবাসায় পরিণত হয়নি, কোন যুবকের অবিশ্রান্ত আগ্রহ তাঁকে বিরক্ত করেছিল। সে সংসারের কেউ নয়— "ঊর্মি বই পড়া মেয়ে, কাজ করা মেয়ে নয়।" তার উপস্থিতি কর্মকান্ডের রক্তকে নিরন্তর চাঞ্চল্যে দোলায়িত করে তোলে সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতেই ঊর্মির আনন্দ। এই সহজাত চঞ্চলতার বশেই সে নিজের কাজ উদ্ধার করে নেয়— " আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে, ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারবো।" সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুশি রাখাটা শর্মিলার মন:পুত , কিন্তু মনকে খুশি রাখাটাই উর্মির খুশির জাত। শশাঙ্কের কাছে সে হয়ে ওঠে 'বিদ্যুৎ লতা।'

শশাঙ্কের মধ্যে প্রিয়ার জন্য যে অতৃপ্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই প্রচ্ছন্নতাকে উদঘাটিত করে দিয়েছে উর্মিমালা। শর্মিলা সেই উদ্‌ঘাটিত প্রচ্ছন্নতাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে। সে শশাঙ্ক ও তার দাম্পত্যের মাঝে ঊর্মিমালাকে গ্রহণ করেছে শশাঙ্ককে সুখী করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ দুই নারীর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—

> "উর্ব্বশী আর লক্ষ্মী এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার, প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রবর্তনা। আছে। একটি শক্তি সে ভিতরে যা কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে ;এবং আর একটি শক্তি সে অর্ন্তনিহিত পরিপক্কতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়। তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।"

ঊর্মির অবস্থানে শশাঙ্কের জীবনে ব্যবসার যে ভাঙন, দাম্পত্যের যে ভাঙন সেই ভাঙনই শর্মিলার দ্বারা পূর্ণ হতে পারলো। তাই শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে—

> " সেই দিন কার মতোই আজ থেকে আবার মনে শোধ করতে বসলুম। যা

Scanned with OKEN Scanner

ডুবিয়েছি তাকে আবার টেনে তুলবই, এই রইল কথা, শুনে রাখো একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

এই ঋণ শোধ কেবল আর্থিক ঋণ শোধ নয়, দাম্পত্যের ঋণ শোধ। আর এই যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস হল ভালোবাসা। অপর দিক থেকে শর্মিলাও তার জীবনের অপূর্ণতার দিক — যা উর্মিমালার মধ্যে দেখে তার প্রতি শশাঙ্ক আকৃষ্ট হয়ে ছিল , নিজের মধ্যে তাকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করছে। তাই সে ও স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠতে চাইছে—

"তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো, কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরী করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও"

ঊর্মিমালা শুধু শশাঙ্কের অন্তরের প্রচ্ছন্নতাকে উদ্‌ঘাটিত করে নি। শর্মিলার নারী সত্তার ও জাগরণ ঘটিয়েছে। যে নারী একদা ভাবতো —"আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলে স্বধর্ম" সেই নারীই স্বামীর কাজের যোগ্য হয়ে উঠতে চাইছে। সে শশাঙ্ককে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়, সে শশাঙ্কের অন্তরকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়।

উপন্যাসের প্রথমে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও উপন্যাসের মর্মব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল উপন্যাসিক তার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের পথেই কাহিনী ও চরিত্রকে পরিচালনা করবেন। সেখানে চরিত্রের ভালোমন্দ, ঘাত প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ থেকে উত্তরিত হয়ে চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতে পারবে না, তাই শর্মিলার মধ্যে আরোগ্য ও আরামের সস্নেহ ব্যগ্রতাকে, বাইরের সম্মান রক্ষার সতর্কতাকে কাহিনীর মধ্যে চারিয়ে দিলেন উপন্যাসিক, আর বর্ষাঋতু, জল দান, ফলদান, তাপ নিবারণ, ঊর্ধ্বলোক থেকে বিগলন, শুষ্কতা দূরীকরণ আর অভাবের পরিপূরণ হয়ে উঠলো তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য। আর ঊর্মিমালা-বসন্ত ঋতু, চঞ্চলতা, উচ্ছলতা, প্রচ্ছন্নতার জাগরণ আর ভাঙন হয়ে উঠল তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

শর্মিলার বাপের বাড়ির চাল চলন এখানে বজায় ছিল, এই পারিবারিক দ্বৈরাজে ব্যবস্থাবিধি তারই অধিকারে ছিল। সে কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটা অস্বীকার করার সাধ্য শশাঙ্কের ছিল না। তাছাড়া মর্ম ব্যাখ্যায় তো রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন — "অল্প স্ত্রীই অমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই নিজের পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নতুন করে তোলে" শর্মিলাতো সেই সুযোগ পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও শর্মিলা মাতৃজাতীয় নারীর টাইপের মধ্যেই থেকে গেল। শর্মিলার মাতৃজাতীয় নারীর আইডিয়ালিজ্‌মের ভিতরে বাস্তব নারীর আর্তনাদ কি ছিল না ? অন্যদিকে আইডিয়ালিজ্‌মের বাস্তব অসম্ভাব্যতার কথা ভেবেই তো ঊর্মিমালা বোম্বাইয়ের পথে যাত্রা করলো। আসলে স্রষ্টার কলম সবসময় স্রষ্টার সচেতন ইচ্ছার আনুগত্য সম্পূর্ণ স্বীকার করে চলে না। স্বভাবতই

Scanned with OKEN Scanner

মাতৃজাতীয় নারী, প্রিয়াজাতীয় নারীর বাহ্যিক নির্মোঘ থেকে বাস্তব নারী হৃদয়ের করুন আর্তনাদ ভেসে এলো। তা ছাড়া তত্ত্ব দিয়ে কি জীবনকে বাঁধা সম্ভব? শর্মিলা, ঊর্মিমালার অব্যক্ত যন্ত্রণার যে আর্তনাদ — যা শর্মিলার পক্ষে স্বাভাবিক ঊর্মিমালার পক্ষে স্বাভাবিক।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তার 'রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দুই বোন উপন্যাসকে ব্যাখ্যা করেছিলেন আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্বমূলক পদ্ধতিতে। গ্রন্থ পাঠে রবীন্দ্রনাথ ৬/০৪/১৯৩৬ এই চিঠিতে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কে লিখেছিলেন—

> "আমার দুই বোন গ্রন্থের যে সমালোচনা লিখেচ তা পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার সাহিত্য বিচারে আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্ব মূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সুনিপুনভাবে প্রয়োগ করেচ। তবু একটা কথা মনে রেখ সাহিত্যকে একান্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করাই তার প্রতি একমাত্র সঙ্গত ব্যবহার নয়। সাহিত্য প্রকাশধর্মী— সেই প্রকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করে সে থাকে অগোচরে রন্ধন শালার উপকরণ ও রন্ধন তত্ত্বের মতো। ভোজনে যে স্বাদ পাই রসগ্রাহীর পক্ষে সেইটেই মুখ্য, সেই স্বাদের বিশ্লেষণ চলে না। কেবল আছে তার উপলব্ধি"।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ না করাই তার প্রতি একমাত্র সঙ্গত ব্যবহার বলে মনে করেন। তেমনি জীবনকেও তো কোন তত্ত্বের রূপায়ন বলা চলে না। কেননা বহুবিচিত্র মানবসত্তার বহু বিচিত্র গতি। তত্ত্ব মেনে জীবন চলে না। তাই মাতৃজাতীয়া নারী হয়েও , উদারতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও স্বামী বঞ্চিত এক বাস্তব নারীর কান্না উঠে এলো। স্বতন্ত্র রীতিতে স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে গিয়ে শর্মিলা ধাক্কা খেয়েছে, তার চোখের জল পড়েছে (যেমন শশাঙ্কের জন্মদিনে শশাঙ্কের বাড়িতে না থাকা ইত্যাদি) কিন্তু স্বামীকে সে খুশি করতে পারে নি, তার মধ্যে অপূর্ণতা আছে তাই অতৃপ্ত স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট— এ শর্মিলার চোখে জল আনে না, আনে হৃদয়ের প্রবল যন্ত্রণাকে। দিদির কাছ থেকে শশাঙ্ক যখন ঊর্মির ছুটি নিয়ে আসে তখন দিদি ছুটি দেয় কিন্তু " সেই সঙ্গে শর্মিলার বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে" দাসীর ডাক পড়ে, মাথায় জলের পটি নিতে হয়। ঊর্মিমালাকে নিয়ে শশাঙ্ক ডায়মন্ডহারবারে যেতে চাইলে শর্মিলা সম্মতি দেয় কিন্তু — "তার বুকের শিরাগুলো মুচড়ে ওঠে,' ' বেদনায় কপালের চামড়া কুঞ্চিত হয়।' শশাঙ্ক চলে যাওয়ার পর—

> "শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার বলতে লাগল আর কেন বেঁচে আছি"

বিবাহের সাম্বৎসরিক এ শশাঙ্ক শর্মিলার জন্য কোন উপহার না দিলে "শর্মিলা আপন মনেই বলে মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, কী হবে এই খেলায়। রাত্রে ঘুম হল না শর্মিলার আর ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে—ঠাকুর তুমি মিথ্যে" শশাঙ্ক তাকে যতই অসাধারণ নারী

Scanned with OKEN Scanner

বলুক, লেখক তাকে যতই মাতৃজাতীয় নারীর তাত্ত্বিক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চান জীবনের দাবি মেনেই তার ভিতরের চাপা কান্না, অনিদ্রায় রাত্রি যাপনের সঙ্গত কারণ বাস্তব নারীর হৃদয়ের দাবি হারিয়ে যাওয়ার আর্তনাদ। এমনকি ঊর্মিমালাকে শশাঙ্কের হাতে সমর্পন করার পরও কি শর্মিলা শান্তি পেয়েছে? যদি স্বামীর উপর যথার্থ দাবি ছাড়তে সে সক্ষম হতো তাহলে তার মনে হতো না যে—শশাঙ্ক এতদিন নিজের হাতে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছিল তার জন্যই শর্মিলা নিজের হৃদয়ের অনেক দাবিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তাদের সম্মিলিত জীবনের মূর্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল ঊর্মির আবির্ভাবে। সে মনে মনে বলতে লাগল—

> "তখনই যদি মরতুম তাহলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্য অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাফ করতে পারবে না, তার দেওয়া অন্ন ওর মুখে বিষ ঠেকবে নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তাহলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।"

সত্যই যদি শর্মিলা অন্তর থেকে তাদের দাম্পত্যে ঊর্মিমালাকে সতীন হিসাবে মেনে নিতে পারতেন তাহলে স্বামীর এই ঊর্মিমালা বিলাসকে তার ' মোহ', 'মদিরা', 'মাতলামি', 'আত্মাবমাননার ক্ষোভ' বলে মনে হত না, সে দোষ দিত না তার নিজের ভাগ্যকে। স্বামীর দৈন্য অপমানের নিদারুণ শূন্যতার আশঙ্কার কথা তার মনে আসতো না।

ঊর্মিমালাও তো তত্ত্ববদ্ধ হয়ে থাকলো না। শশাঙ্কের প্রতি তার প্রাণের টান। ঊর্মিমালার ভিতরেও সেই বাস্তব নারীর কান্না সঞ্চারিত। নিজের দিদির ভাগ্য চূর্ণ করে সে নিজের ভগ্নীপতিকে ভালোবেসেছে। শর্মিলা মেনে নিলেও শশাঙ্ককে বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তার প্রাণের এই কান্না—

> "ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না, উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না, ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে, মনে— ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্ম তালিকা, রাত্রের সুখ নিদ্রা?"

উপন্যাসিক তো তাকে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' করেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঊর্মির কান্নার উৎস মুখ কোথায়? তুমি কোনো গৃহ প্রান্তে নাহি জ্বালো

Scanned with OKEN Scanner

সন্ধ্যাদীপখানি,'/ দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পবক্ষে নম্র নেত্র পাতে/ স্থিত হাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যায়/স্তব্ধ অর্ধরাতে।" তুলসীর মূলে সন্ধ্যা দ্বীপ জ্বালতে না পারা, নম্র নেত্র বাসর শয্যাতে যেতে না পারার বাস্তব প্রতিবন্ধকতাই তো ঊর্মিমালার কান্নার উৎস মুখ। আর সে সুখী জীবনের স্বপ্নও হয়তো আর দেখে না তাই দিদিকে লেখা চিঠিতে পাই — "কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি, আর সুখ যদি না হয়তো নাই হল।"

এই জাতীয় নারীরা তো ক্ষমা চায় না, তবে শর্মিলার পায়ের কাছে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কেনই বা ক্ষমা চাইছে? প্রিয়াজাতীয় এই নারীর মধ্যে সতীত্বের ভাবনা তো কাজ করে না, তবে বাবার সম্বন্ধ করা পাত্র নীরদের 'প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে কেন? এ নারী রক্তের মধ্যে চঞ্চলতাই জাগিয়ে তুলে চলে যায় তার জন্য তার ভাবনা থাকে না। কিন্তু শশাঙ্কের জন্য ঊর্মিমালার ভাবনার কথা সে ব্যক্ত করেছে— 'তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া, লাগবে। আমার জন্য ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইলো মনে" ঊর্মির এই আর্তনাদ তাকে প্রিয়ার ভাবনায় বদ্ধ রাখলো না।

শশাঙ্ক শর্মিলা-ঊর্মিমালার স্রষ্টা তো সেদিন —"রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় পুরুষের দৃষ্টি ভঙ্গিতে একই নারীর মধ্যে উর্ব্বশী আর লক্ষ্মীকে মিলিয়ে দেখেছিলেন—

"একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে
আমি সম্ভম ভরে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দূরে অবনত শিরে" —চিত্রা

কবিকল্পনায় যাকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল আজ উপন্যাসে বাস্তব জীবনের দুই নারীকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না। পুরুষ একই নারীর মধ্যে যে সহাবস্থান কামনা করে তার মেলবন্ধন বাস্তবে ঘটে না। উপন্যাসিকেরও প্রত্যাশা ছিল— "তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ'আর সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে " কেউবা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুয়ের মিশেল" বাস্তব জীবনে সেই মিশেলটাই ঘটলো না। শশাঙ্ক চাইলো, শর্মিলা বাইরে থেকে চাইলো কিন্তু ঊর্মিমালা বোম্বাইয়ের পথে রওনা হল।

'দুই বোন' উপন্যাস রচনার কয়েক মাস পর ১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'মালঞ্চ'

Scanned with OKEN Scanner

উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেখানে নীরজা চরিত্রে পুরুষের কাঙ্খিত নারীকেই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন। নীরজা চরিত্রে কল্যাণময়ী মাতৃরূপের অভাব নেই আবার প্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও তার চরিত্রে আবার সমানভাবে বিদ্যমান। শর্মিলা উপন্যাসের শেষে স্বামীর কাছে কামনা করেছিল—"তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি, সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও" নীরজা তো আদিত্যের কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। আদিত্যের বাগানের কাজে সে আদিত্যের মতোই সমান দক্ষ। প্রিয়াজাতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান—

"বিবাহের পর দিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে, এই বাগানের নানা সেবায় নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ, নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করছে ভিন্ন ভিন্ন গাছে পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্য।"

স্বামী নামক আইডিয়াকে ভালোবাসার মতো নারী নয় নীরজা। সে পুরুষকেই ভালোবাসে। আবার সেই ভালোবাসার মধ্যে নিত্য নতুনের স্বাদ ছিল। শর্মিলার মতো এক ঘেয়ে সেবা শশাঙ্কের মতো আদিত্য কে অতীষ্ট করে মারেনি, তাতে সে ক্লান্ত বোধ করেনি। তাই তো আদিত্য নীরজার ভালোবাসা নব নব রূপ নিয়েছিল, নব নব সৌন্দর্য্যে। "কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে, সংসারের বারো আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘর কন্যার আসবাব?" তার নারী ব্যক্তিত্বের জোরেই সে আদিত্যের কাছে হয়ে উঠেছিল তার 'রঙমহলের সাকী' তার ' পেয়ালা ছিল ভরা' কালিদাসের কালের মতোই তার পদাঘাতে প্রস্ফুটিত হত কুসুম, বকুল উঠত ফুটে। আর আদিত্য বলত—

> "আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি দুধারে ফুল ফুটেছে, রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপ বনে লেগেছে তার নেশা"

এই জন্যই নীরজা আদিত্যের 'নন্দন বনের ইন্দ্রানী' বনলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা মালিনী, গৃহ সচিব-এ বিশেষণ গুলো আদিত্যেরই দেওয়া।

গণেশের ছেলেকে নিয়ে "নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন" তার সন্তান সম্ভাবনায়—"ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে। নব নব প্রভাতের প্রভাত হাওয়ায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে" মালীদের প্রতি স্নেহ মমতা, ডালকুকুরের প্রতি তার ভালোবাসা। "নীরজার ভালোবাসায় ছিল প্রচন্ড জেদ, সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত" নীরজার মধ্যে এই দ্বৈত সত্তার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেই "উপন্যাসে বাস্তবতা :

Scanned with OKEN Scanner

রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্র গুপ্ত বলতে চেয়েছিলেন—

> "নীরজা পূর্ণ নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মায়ের মমতা কল্যানী বুদ্ধি এবং প্রিয়ার ভালোবাসা দুই-ই নীরজার আছে। তাই এক হাতে সে ছড়াতে চায়, অন্যহাতে বেদনা পায়"

শর্মিলা রাবীন্দ্রিক তত্ত্বের ফাঁসে মাতৃরূপে অবতীর্ণ। শশাঙ্কের সুখই তার একমাত্র কাঙ্খিত। উর্মিমালার সঙ্গে সে তাই স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে। আর নীরজা— যে স্বামীকে প্রিয়ার ভালোবাসা আর মায়ের স্নেহ দান করেছে সে সরলার সঙ্গে স্বামীর সহাবস্থানে ঈর্ষাবোধ করে। তাই সরলার সঙ্গে রমেনের বিবাহের ঘটকালি করতে এগিয়ে আসে তার পথের কাঁটা দূর করতে। রমেনের সামনে সরলার সুন্দর নারী শরীরের ও গুনোপনার বর্ণনা দেয় আর স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে সরলার অশুভ লক্ষণের কথা তুলে ধরে। সরলার জন্যই মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়েছে—

"অলক্ষুনে মেয়ে। দেখো না— মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলন। মেয়ে মানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যান ঘটে"

পূর্ণব্যক্তিত্বময়ী এই নারী স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। ঈর্ষা বোধ করে। সে শর্মিলা নয়। তার মৃত্যুর পর তার অনুপস্থিতিতে তার স্বামীর মনে তার অভাব থাকবে না, স্বামীর হৃদয়ে সে বিন্দু মাত্র অবস্থান করবে না—এ নীরজার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। শর্মিলার মতো সে ও সরলার হাতে সমস্ত কিছু দান করে দিতে চেয়েছে— মহত্ত্ব দেখাতে। কিন্তু এই মহত্ত্ব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া - রমেনের বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়া। তাই এর জন্য ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া বলে—নীরজাকে ঠাকুর ঘরে যেতে হয়, নিজের মুক্তোর মালা বের করে সরলার গলায় পরিয়ে দিতে হয়। জেল ফেরৎ সরলার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়—যাতে সরলার সামনে নিজের সবকিছু সে দান করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরজা তা পারে নি। সরলা প্রমাণ করতে এলে স্বতস্ফূর্ত ভাবে তার পা সরে গেছে। ভাঙা গলায় বলে উঠেছে—"পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারবো না, পারবো না, ' সরলাকে রুক্ষ গলায় বলে—"জায়গা হবে না রাক্ষসী, আমি থাকবো আমি থাকবো" রোগ শীর্ণ পান্ডুর মূর্ত্তি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলে— 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধবে তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলবো তোর রক্ত" এই নারীই বাস্তব নারী, যথার্থ জীবন রসের রসিক। সে কোন তত্ত্বের প্রতিভূ হতে চায় না।

'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বলতে চেয়েছিলেন—"দুই বোন লিখে রবীন্দ্রনাথের যেন তৃপ্তি হল না ;বিষয়টিকে আরো নির্মম ভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছায় অল্পকাল পরেই আবার তাকে লিখতে হল মালঞ্চ", দুই বোনের তাত্ত্বিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত

Scanned with OKEN Scanner

ছিলেন না। তাছাড়া তাত্ত্বিক ভাবনার মধ্যে 'দুইবোন' সীমাবদ্ধ থাকে নি। শর্মিলা, ঊর্মিমালারা মাতৃজাতীয় প্রিয়াজাতীয় নারীর অতিরিক্ত আবেদন নিয়ে উপন্যাসে উঠে এলো। এ প্রসঙ্গে ই ক্ষেত্রগুপ্ত—'উপন্যাসের ইতিহাস' দ্বিতীয় খন্ডে বলতে চেয়েছিলেন—"এ গল্পে শিল্পকে বাঁধতে পারে নি কোন বীতংস — লেখার জোর ছাপিয়ে গেছে তাত্ত্বিক অভিপ্রায় কে" তারা আধুনিক বাস্তব নারী হিসাবেই উপন্যাসে উঠে এলো, আর 'মালঞ্চে' তো কোন তত্ত্বের বালাই নেই। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তাকে লিখতে হয়েছিল—

"সাহিত্য প্রকাশধর্মী— সেই প্রকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করে, সে থাকে অগোচরে রন্ধন শালার উপকরণ ও রন্ধন তত্ত্বের মতো"

তাই তাত্ত্বিক প্রেরণা বা উপকরণ যাই থাক তা শিল্পীর অন্তর্গত প্রেরণা। তার সঙ্গে উপন্যাসকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে না। প্রশ্নটা উঠেছে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রথমে তত্ত্বটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলেই।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

১. রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র—অশোক বুক এজেন্সি
২. বলাকা — রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বভারতী
৩. সোনারতরী - রবীন্দ্রনাথ - রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
৪. চিত্রা- রবীন্দ্রনাথ — বিশ্বভারতী
৫. রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য - বুদ্ধদেব বসু — নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬. রবীন্দ্রনাথ - বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় —পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
৭.রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায় —নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৮. ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ - ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ — এ কে সরকার অ্যান্ড কোঃ
৯. উপন্যাসে বাস্তবতা : রবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র গুপ্ত - চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ
১০. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —
মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (২) ক্ষেত্রগুপ্ত —গ্রন্থ নিলয়
১২. উদ্দালক - রবীন্দ্র উপন্যাস সংখ্যা
১. বোন সতীনের ভাবনায় দুইবোন ও মালঞ্চ (প্র) মালঞ্চ লাহিড়ী
২. দুই বোন : মানবাত্মার খন্ড সত্তা (প্রবন্ধ) বিকাশকান্তি মিদ্যা

Scanned with OKEN Scanner